৩.৪ নির্বাচন কমিশন (Election Commission) :

ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি যে চারটি প্রধান স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে অন্যতম হোচ্ছে নির্বাচন কমিশন। অপর তিনটি স্তম্ভ হোচ্ছে—সুপ্রীম কোর্ট, রাষ্ট্রপতিক কমিশন এবং ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক। ভারতীয় গণতন্ত্রের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার উপর। এই কমিশন যদি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও দক্ষ না হয় তবে ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি শক্তিহীন হোয়ে পড়বে — এই মনোভাব গণপরিষদে ব্যক্ত করেছিলেন পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু। তিনি বলেছিলেন যে, নির্বাচন ব্যবস্থা যদি নানা ত্রুটিতে পরিপূর্ণ থাকে অথবা সুদক্ষ না হয় কিংবা এমন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয় যাদের সততার ওপর নির্ভর করা যায় না তবে গণতন্ত্র তার উৎসতেই বিষাক্ত হোয়ে পড়বে। এই কথা স্মরণে রেখেই সংবিধান রচয়িতারা নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে দীর্ঘ সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

কমিশনের গঠন : সংবিধানের ৩২৪(২) ধারা অনুযায়ী একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। সব কমিশনারগণই রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। অন্যান্য কমিশনারদের সংখ্যা সংবিধানে নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, বলা হোয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কমিশনারদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করে দেবেন। তবে রাষ্ট্রপতির এই নিয়োগ ক্ষমতা সংসদ প্রণীত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-এর নিয়োগ ক্যাবিনেট ও মুখ্যত প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। কমিশনের সদস্য সংখ্যা একাধিক হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এই সংস্থার সভাপতি হিসাবে কাজ করবেন।

১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসাবে শুধু মুখ্য কমিশনারই কাজ করেছেন। এরপর শুরু হয় কমিশন গঠন নিয়ে রাজনীতির খেলা। ১৯৮৯ সালে নবম লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার ঠিক আগে রাজীব গান্ধী সরকার রাষ্ট্রপতিকে দুজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করে এবং সেইমতো ১৬ই অক্টোবর ১৯৮৯ সালে অবসর-প্রাপ্ত আই.এ.এস. অফিসার এস.এস. ধানোয়া ও অবসরপ্রাপ্ত আই.পি.এস. অফিসার ভি.এস. সায়গলকে কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। সেইসময় মুখ্য কমিশনার ছিলেন আর. ভি. পেরী শাস্ত্রী। ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দল পরাজিত হয় এবং ভি. পি. সিং-এর নেতৃত্বে জাতীয় ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। নতুন সরকার ১৯৯০ সালের শুরু থেকেই দুজন কমিশনারকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা জানান এবং সেইমতো ২রা জানুয়ারী ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমন এক নির্দেশ জারী করে দুজন কমিশনারকে সরিয়ে দেন। ফলে, নির্বাচন কমিশন পুনরায় এক সদস্য বিশিষ্ট হোয়ে পড়ে।

পেরী শাস্ত্রীর পর টি. এন. শেষন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রূপে নিযুক্ত হন। শেষনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে দেশ জুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। অনেকে তাঁর কাজের প্রশংসা করলেও তাঁর নির্বাচন বাতিল ও স্থগিত করার সিদ্ধান্তগুলিকে স্বৈরাচারিতার পরিচয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনকে এক সদস্য বিশিষ্ট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে নরসিম্‌হা রাও সরকারের ক্যাবিনেটের অনুরোধে রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা এক অর্ডিন্যান্স জারী করে পুনরায় নির্বাচন কমিশনকে তিন সদস্য বিশিষ্ট করেন। দুই নতুন কমিশনার হন কৃষি দপ্তরের সচিব এম.এস. গিল ও আইন কমিশনের সদস্য জি.ভি.জি. কৃষ্ণমূর্তি। রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্সে আরও

ঘোষণা করা হয় যে, কমিশনারের সদস্যরা যথাসম্ভব একমত হোয়ে কাজ করার চেষ্টা করবেন এবং মতবিরোধ যদি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে তিন সদস্যের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই কার্যকরী হবে। রাষ্ট্রপতির এই অর্ডিন্যান্স তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যেই জারী করা হোয়েছে বলে মনে করে মুখ্য কমিশনার শেষন আদালতের দ্বারস্থ হন। রাষ্ট্রপতির অর্ডিনান্সকে সংবিধান বিরোধী বলে দাবী করে তিনি বলেন যে, দুই নব নিযুক্ত কমিশনার ও মুখ্য কমিশনার কখনই সমান পদমর্যাদা সম্পন্ন হোতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্ট অবশ্য যে অন্তর্বর্তীকালীন রায় দেয় তাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে, ১৯৯৫ সালে সুপ্রীম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত দেয় তাতে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্সের বৈধতা স্বীকার করে বলা হয় যে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ব্যতীত অন্য কমিশনার নিয়োগ করা হবে কিনা সে ব্যাপারে সরকারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং সেই সিদ্ধান্ত আদালতের বিচার্য বিষয় নয়। সেই থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা তিনই আছে।

যে কোন নির্বাচনের ব্যবস্থা করার পূর্বে নির্বাচন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে পারেন। ১৯৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের কাজকর্ম তদারকি করার জন্য ৬ জন আঞ্চলিক কমিশনার নিয়োগ করা হয় যাঁরা পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল স্থানগুলিতে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে কমিশনারকে সাহায্য করেন। আঞ্চলিক কমিশনারদের কার্যকাল হবে ৬ মাস। তাছাড়া প্রতিটি রাজ্যে একজন করে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার এবং জেলা স্তরে একজন জেলা নির্বাচনী অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের কাঠামোর সঙ্গে যে সব কর্মচারীরা জড়িত আছেন তাঁদের মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে স্তর বিন্যাস করা যায় ঃ সর্বোচ্চ স্থানে আছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং তাঁর পরে আছেন যথাক্রমে অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনার। তাঁদের নীচে আছেন একজন সচিব, উপ-সচিব, গবেষণামূলক কাজে রত ও তথ্যানুসন্ধানকারী ব্যক্তিরা, মুখ্য কমিশনারের ব্যক্তিগত সচিব ও অন্যান্য সাহায্যকারী কেরানিগণ।

নির্বাচন কমিশনারের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ঃ

ভারতে নির্বাচন কমিশন যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য সংবিধানে বিশেষ কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোয়েছে ঃ

(১) কমিশনারদের চাকরীর শর্তাবলী ও কার্যকালের মেয়াদ পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কমিশনারদের কার্যকালের মেয়াদ হোল ছ'বছর অথবা ৬৫ বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ ছ'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি কোন কমিশনার ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ করেন তবে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। সংবিধানের ৩২৪(৫) ধারায় কমিশনারদের অপসারণ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ না করে রাষ্ট্রপতি বা সরকার ইচ্ছামতো কমিশনারদের অপসারণ করতে পারবে না। কেবলমাত্র প্রমাণিত অসামর্থ্য অথবা অসদাচরণের অভিযোগের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতি কমিশনারকে অপসারণ করতে পারেন। সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের যে পদ্ধতি দ্বারা অপসারণ করা যায় সেই পদ্ধতি মুখ্য কমিশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই পদ্ধতি হোচ্ছে যে, প্রথমত কমিশনারের বিরুদ্ধে অসমর্থতা অথবা অসদাচরণের অভিযোগ আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টের

উভয় কক্ষ দু-ভাবে সেই অভিযোগ সমর্থন করে প্রস্তাব পাশ করবে—(ক) একটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী এই প্রস্তাব সমর্থন করবে এবং (খ) সেই কক্ষের উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ এই প্রস্তাব সমর্থন করবে। দুটি কক্ষেই উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরই রাষ্ট্রপতি মুখ্য কমিশনারকে পদচ্যুত করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও আঞ্চলিক কমিশনারদের অপসারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে মুখ্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়। সুতরাং কমিশনারদের অপসারণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। এই জটিল পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকার জন্যই কমিশনারদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব হয়।

(২) নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্য সংবিধানে বলা হোয়েছে যে, নিয়োগের পর মুখ্য কমিশনারের বেতন, ভাতা ও চাকরির শর্তাদি এমনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না যাতে তাঁর স্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

(৩) নির্বাচন কমিশন যাতে তার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন কর্মচারী সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন। [৩২৪(৬)]

(৪) নির্বাচন কমিশনারদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত ব্যয় পার্লামেন্টের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই এই ব্যয় পার্লামেন্টের দ্বারা অনুমোদিত হয় না। ভারতের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India) থেকে এই অর্থ ব্যয় করা হয়।

উপরোক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। ১৯৭২ সালে সাদিক আলি বনাম নির্বাচন কমিশনার মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে যে, ভারতে নির্বাচন কমিশনকে শাসন ও আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রাখা হোয়েছে। পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভাগুলি সংবিধানের ৩২৭ ও ৩২৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত আইন পাশ করতে পারে কিন্তু এই ক্ষমতা সংবিধানের ৩২৪নং ধারা সীমিত। ৩২৪নং ধারাতে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of Election Commission) ঃ

ভারতীয় সংবিধানে ৩২৪ (১) ধারায় নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। এই ধারায় সংক্ষেপে যা বলা হোয়েছে তা হোল এই যে, নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং এ বিষয়ে নির্দেশ দান করার ক্ষমতা কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হোয়েছে। ৩২৪(১) নং ধারার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হোলেও এর ব্যাপকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে, নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজই তিনটি শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা যায়—(১) তত্ত্বাবধান, (২) নির্দেশনা ও (৩) নিয়ন্ত্রণ। কমিশনের কিছু ক্ষমতা ও কার্যাবলীর উল্লেখ আমরা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনেও পাই। কমিশনের কর্মযজ্ঞের বিশালতার পরিচয় নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যায় ঃ

(১) ভোটদাতাদের তালিকা প্রস্তুত — নির্বাচন পর্বের আয়োজন শুরু হয় ভোটদাতাদের তালিকা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। ভোটাধিকার অর্জনের যে সমস্ত শর্ত সংবিধানে আছে যেমন—ভারতীয় নাগরিকত্ব, কমপক্ষে ১৮ বছর বয়ঃসীমা, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় বসবাস করা, ইত্যাদি অনুসরণ করে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই বিরাট কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য বহু কর্মী

নিয়োগ করা হয় যাঁরা বিভিন্ন গৃহে অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির ভিত্তিতে ভোটদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করেন। একই লোকের নাম যাতে দুটি কেন্দ্রে না থাকে, অযোগ্য প্রার্থীদের নাম যাতে তালিকায় না থাকে ইত্যাদি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকা সম্পর্কে অভিযোগ নির্দিষ্ট দিন ও সময়ের মধ্যে জানাতে হয়। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। এইভাবে কমিশন নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করে।

(২) **নির্বাচন পরিচালনা**— ভারতের মতো বিশালায়তন ও জনবহুল দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তা পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর কর্মী। নির্বাচন পরিচালনার কাজটি অত্যন্ত ব্যাপক। বিভিন্ন ধরনের কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন—
(ক) নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হোচ্ছে কমিশনের কাজ। দিন ঘোষণার পূর্বে কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে। ইদানীংকালে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একই রাজ্যে ভোট গ্রহণের একাধিক দিন ধার্য করা হয়। প্রয়োজন হোলে দিন পরিবর্তন করা যায়। নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভোটপ্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল এবং তা প্রত্যাহার করার দিন ঘোষণা করতে হয়। পরে মনোনয়ন পত্রগুলি যাচাই করে বিধিসম্মত প্রার্থীদের নাম জানানো হয়।

(খ) নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা কমিশনের এক বিতর্কমূলক কাজ। নির্দিষ্ট ঘোষিত দিনে ভোটদান অনুষ্ঠিত হোলেও নিয়ম লঙ্ঘন, দুর্নীতিমূলক কিয়াকলাপ, বিশৃঙ্খলা, ভোটের কারচুপি ইত্যাদি কারণে অনেক সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট বাতিল করে দিতে হয় এবং সাময়িকভাবে নির্বাচন স্থগিত রেখে পুনরায় নির্বাচনের নির্দেশ দিতে হয়। কমিশনের এই পদক্ষেপ বিতর্কের সৃষ্টি করে। নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হোলে কমিশনের কর্তব্য হোল নির্বাচন বাতিল করা, অন্যদিকে বাতিল করার ফলে যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কমিশনকে তাদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হয়।

(গ) নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগের মীমাংসা করা আর একটি কঠিন কাজ। নির্বাচন চলাকালীন বিভিন্ন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষের কাছ থেকে আসে। বিশেষ করে, বলপ্রয়োগ করে ভোটকেন্দ্র দখল, ন্যায্য ভোটদাতাদের ভোট প্রদানে বাধাদান, নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন ইত্যাদি কারণে নানা অভিযোগ কমিশনের কাছে আসে। এইসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা, তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা প্রভৃতি কাজ কমিশনকে করতে হয়।

(৩) **রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি প্রদান ও তা প্রত্যাহার** — ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব সংশোধনী আইনে একটি নতুন অংশ IV A যুক্ত করে বলা হোয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলিকে কমিশনের স্বীকৃত দলের তালিকার নথিভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সুতরাং কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হোল দলগুলিকে স্বীকৃতি দান করা। নির্বাচন কমিশনের রীতি অনুযায়ী তিন শ্রেণীর রাজনৈতিক দল থাকতে পারে— (১) নথিভুক্ত বা রেজিস্ট্রিভুক্ত দল কিন্তু জাতীয় বা আঞ্চলিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। (২) রেজিস্ট্রিভুক্ত জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলি। (৩) রেজিস্ট্রিভুক্ত আঞ্চলিক দল হিসাবে স্বীকৃত দলগুলি। ১৯৬৮ সালের নির্বাচনী প্রতীক সংক্রান্ত আদেশের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলা হোয়েছে যে, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দলগুলিকে জাতীয় ও আঞ্চলিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অনেক সময় কোন রাজনৈতিক দল যদি নির্দ্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তবে সেই দলের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ক্ষমতাও কমিশনের আছে।

(৪) **নির্বাচনী প্রতীক নির্দ্ধারণ** — কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতীক বণ্টন করে। অনেক সময় মূল রাজনৈতিক দলে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। এর ফলে দলের প্রতীক নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। কমিশন এই বিরোধের মীমাংসা করে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই যখন কংগ্রেস দলে ভাঙ্গনের পর কংগ্রেস (ই) ও কংগ্রেস (স) উভয়েই কংগ্রেসের প্রতীক ব্যবহারের দাবী জানায়। কমিশন কংগ্রেস (ই) দলকেই মূল কংগ্রেস দল হিসাবে মেনে নেয় এবং কংগ্রেস দলের প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দেয়। অনুরূপভাবে, লোকদল (অজিত) ও লোকদল (বহুগুণা) নামে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতীক নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে কমিশন লোকদল (বহুগুণা) গোষ্ঠীকেই লোকদলের প্রতীক প্রদান করে। রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি দান ও নির্বাচনী প্রতীক দান সংক্রান্ত কমিশনের ক্ষমতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট A.P.H.L. Conference, Shillong বনাম W.A. Sangma মামলায় রায় দিয়েছে যে, এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(৫) **কর্মচারী ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ**— সংবিধানের ৩২৪ (৬) ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালদের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাতে পারে। কমিশনের অনুরোধ মতো রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। নির্বাচনের কাজ সম্পাদন করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করার ক্ষমতা যেমন রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের আছে তেমনি নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা কমিশনের আছে। এই পর্যবেক্ষক নির্বাচনে নানা দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ভোট প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন কর্তৃত্ব ঘোষিত আচরণ বিধি ঠিকমতো অনুসরণ করছে কিনা তা তদারক করার দায়িত্ব পর্যবেক্ষকের। পর্যবেক্ষক কমিশনের কাছে তার পর্যালোচনার বিবরণ পেশ করে এবং কমিশন এই বিবরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(৬) **আইনসভার সদস্যদের অযোগ্যতা সম্পর্কে পরামর্শ দান**— সংসদ ও রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অযোগ্যতা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারে। সংবিধানের ১০৩ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে কমিশন সাংসদের অযোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্ন বিবেচনার জন্য পাঠায়। অনুরূপভাবে, সংবিধানের ১৯২ ধারা অনুযায়ী রাজ্য আইনসভার সদস্যের অযোগ্যতার প্রশ্নটি রাজ্যপালের বিবেচনার জন্য পাঠানো যায়। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা চূড়ান্ত।

(৭) **রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ**— প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে যাতে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কমিশনের কাজ। কমিশনের এই দায়িত্ব কিছুটা অভিনব। এই দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি রক্ষা সম্পর্কে কমিশন সজাগ দৃষ্টি রাখে। এই দিক থেকে বিচার করলে কমিশনকে দলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পর্যবেক্ষক ও রক্ষক বলে মনে করা যেতে পারে।

(৮) **নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষা**— কমিশনকে আরও একটি বিতর্কমূলক কাজ করতে হয়। নির্বাচনের প্রার্থীরা নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত যে হিসাব কমিশনের কাছে পেশ করে তা পরীক্ষা করে দেখা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। এই কাজ সুষ্ঠুরূপে পালন করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ এ ব্যাপারে কমিশনের যে কোন আচরণই কঠোরভাবে সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৯) তফ্‌সিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যার পুনর্বিবেচনা— লোকসভায় ও রাজ্য বিধানসভায় তফ্‌সিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য যে সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করা হয় তার পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হোয়েছে।

(১০) নির্বাচনী আচরণ বিধি নির্দ্ধারণ— প্রতিটি নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের কর্মীদের এবং প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী আচরণ বিধি ঘোষণা করে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কমিশন যেসব আচরণবিধি ঘোষণা করেছে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিধিগুলি হোল নিম্নরূপ ঃ

(১) জাতপাত বা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভোটের আবেদন করা যাবে না।

(২) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্বাচনী প্রচারে জড়িত করা চলবে না।

(৩) কোন বাড়ীর মালিকের অনুমতি ব্যতীত রাজনৈতিক দল সেই বাড়ীর দেওয়ালে পোস্টার বা শ্লোগান লিখতে পারবে না।

(৪) নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত কোন কর্মচারীকে নির্বাচন শেষ হওয়ার আগে অন্যত্র বদলি করা চলবে না।

(৫) ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতা না হোলে মন্ত্রীরা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

(৬) বেতার ও দূরদর্শনে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচার কার্যের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রের বৈষম্য করা যাবে না।

(৭) শাসকদল নির্বাচনী কাজে সরকারী যানবাহন ব্যবহার করতে পারবে না।

(৮) নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার পর কোন মন্ত্রী জনগণের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান বা অন্য কোন সুবিধাজনক প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না।

(৯) ভোটদাতাদের ভোট দান কেন্দ্রে নিয়ে আসা, ভোটদাতাদের ভীতি প্রদর্শন করা এবং ভোটদান কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে ভোটদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করা নিষিদ্ধ।

(১০) পরিচয় পত্র বা ব্যাজ ব্যতীত কোন দলীয় কর্মীকে ভোটকেন্দ্রের মধ্যে কাজ করতে দেওয়া হবে না।

(১১) ১৯৯৬ সালে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত আচরণ বিধি রচনা করেছে। এগুলির মধ্যে আছে—(ক) প্রার্থীর নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে হবে, (খ) নির্বাচনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ জানাতে হবে।

৩.৫ নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ন ঃ

ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ নির্বাচন কমিশনকে ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকর্তা হিসাবে মনে করেছিলেন। তাই কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্য কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কমিশনের ভূমিকার মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, মুখ্যত দুটি দিক থেকে কমিশনের কার্যাবলীকে বিবেচনা করা যায়—একটি সাংবিধানিক এবং অপরটি বাস্তব দিক।

এই দুই দিক থেকে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে ঃ

প্রথমত, ভারতে নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলীর কেন্দ্রীয়করণ করা হোয়েছে। কমিশনের গঠন ও পরিচালনা রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও পার্লামেন্টের আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। এই ব্যাপারে রাজ্যগুলির কোনো ভূমিকা নেই। এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী বলে অনেকে মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু রাজ্য সরকারগুলিকে নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে শক্তিহীন করে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক ব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি হল যে, কমিশনের গঠনের রাজনীতিকরণ ঘটেছে। যদিও সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে কমিশন গঠনের ভার দেওয়া হোয়েছে তবু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেটই কমিশনারদের নিযুক্ত করেন। তাই কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে কতোখানি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হয় সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অধিকাংশ কমিশনারগণকে আমলাদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করা হোয়েছে। অনেক সময় তাই দাবী উঠেছে যে, বিচারক বা আইনজ্ঞদের মধ্য থেকে কমিশনার নিয়োগ করা হোক। সংবিধানে কমিশনারদের যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকায় কমিশনের নিরপেক্ষতা আরও বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যতদিন পার্লামেন্ট এ ব্যাপারে আইন না করছে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বাস্তবে সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলে শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিরাই যে কমিশনার নিযুক্ত হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুখ্য কমিশনার হিসাবে শেষনের নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সুব্রমনিয়ামস্বামীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পেরী শাস্ত্রী অসুস্থ হোয়ে পড়ায় শ্রীমতী রমা দেবীকে অস্থায়ী মুখ্য কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। পরে যখন পেরী শাস্ত্রী মারা যান তখন ঐ পদে রমা দেবীর নিযুক্ত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক এবং এ ব্যাপারে তাঁকে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দলীয় স্বার্থে সুব্রমনিয়ামস্বামী রমা দেবীর পরিবর্তে শেষনকে নিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করেন। এই ব্যতিক্রমের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার দুর্নীতি সম্পর্কে ও হরিয়ানার মেহাম উপনির্বাচন গ্রহণে বিলম্ব করার জন্য রমা দেবী সরকারের যে তীব্র সমালোচনা করেন তার জন্যই তাঁকে নিয়োগ করা হয়নি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ কতোখানি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এইজন্যই এস. আর. মাহেশ্বরী সুপারিশ করেছেন যে, মুখ্য কমিশনারকে নিয়োগ করার আগে ভারতের প্রধান বিচারপতি ও লোকসভার বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

তৃতীয়ত, নির্বাচন কর্মযজ্ঞের সুষ্ঠু সম্পাদনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। কিন্তু এই দুরূহ ও বিরাট কার্য নির্বাহের জন্য যে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে কমিশনের কোন ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের কাছে কর্মচারী নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানোই হোচ্ছে কমিশনারের কাজ। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন বা ব্যয়নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরীক্ষক যেমন অধস্তন কর্মচারীদের চাকরীর শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভোগ করেন নির্বাচন কমিশন তা করতে অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, এ এক বিচিত্র ব্যবস্থার নিদর্শন যেখানে কঠিন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব একজনের হাতে দেওয়া হোয়েছে কিন্তু সেই কাজ করার জন্য কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব অন্যজনের উপর ন্যস্ত করা হোয়েছে।

চতুর্থত, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্য সংবিধানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল যে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অবসর গ্রহণের পর অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত হোতে পারবেন না। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা সংবিধানে না থাকায় প্রধানত দুভাবে কমিশনারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হোয়েছে। প্রথমত, অবসর গ্রহণের পর যাতে সরকারী দাক্ষিণ্য লাভ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে অনেক কমিশনার সরকারের সপক্ষে বিভিন্ন সময়ে মন্তব্য করেছেন। সরকারের প্রতি এই আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে কে. ভি. কে সুন্দরমকে অবসরের পর আইন কমিশনের সভাপতি করা হোয়েছিল। অনুরূপভাবে, সুকুমার সেনকে উপাচার্য করা হোয়েছিল। তাছাড়া উপরোক্ত দুই কমিশনারই দীর্ঘ প্রায় আট বছর নিজেদের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, এর সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। সরকারের সমালোচনা বা সরকারের পছন্দ নয় এমন কাজ করার জন্য কমিশনারকে সরকারী অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করা হোয়েছে। ১৯৮১ সালে উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে নানা দুর্নীতির অভিযোগ করেন ডি. এস. পি. দলের নেতা এইচ. এন. বহুগুণা। এই নির্বাচন বাতিল করার জন্য তিনি যে আবেদন করেন তদানীন্তন মুখ্য কমিশনার শাকধের তা সমর্থন করেন। মুখ্য কমিশনারের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ঐ কেন্দ্রে অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজন হোলে অন্য রাজ্য থেকে পুলিশী সাহায্য নিতে তিনি দ্বিধা করবেন না। সরকারের কাছে এই নিরপেক্ষতা গ্রহণযোগ্য হয়নি। সম্ভবত এই কারণেই মুখ্য কমিশনার শাকধের শাসক দলের কিছু প্রভাবশালী নেতাদের বিরাগভাজন হন এবং তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি।

পঞ্চমত, বাস্তব দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব কমিশনের উপর দেওয়া হোয়েছে কিন্তু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে যে এ কাজ করা সম্ভব নয় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের আর নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব কমিশনারদের। এই উভয় দায়িত্বের সহাবস্থান ব্যতীত নির্বাচন অবাধ হোতে পারে না। বাস্তবে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের অক্ষমতা এবং পুলিশবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অনেক সময় সফল হোতে দেয়নি।

ষষ্ঠত, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করে ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ করে বলা হয় যে, কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার পর পুনরায় বিধানসভার নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি আছে কি না তা বিচার করে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার ভার নির্বাচন কমিশনের। রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি কাজের সঙ্গে কমিশনকে যুক্ত করার ফলে কমিশনকে রাজনীতির আঙ্গিনায় নিয়ে আসা হোয়েছে।

সাংবিধানিক ও বাস্তব দিক থেকে নির্বাচন কমিশনের নানা ত্রুটি ধরা পড়লেও কমিশনের ভূমিকার সফলতার দিকটি উপেক্ষা করা যায় না। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়—শেষনের নিয়োগের পূর্ব ও নিয়োগের উত্তর পর্ব। শেষনের পূর্ববর্তী সময়ে কমিশনের ভূমিকা কিছুটা ম্লান ছিল এবং সরকারের সঙ্গে কমিশন মোটামুটি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিল। মুখ্য কমিশনার হিসাবে শেষনের নিয়োগ কমিশনকে সক্রিয় করে তুলল। নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার